Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.46-52
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সেলিম আল দীনের 'প্রাচ্য' : ভাষা ও শৈলীগত বিশ্লেষণ

সঞ্জিৎ সরকার
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী

Abstract

*My prime aim in this article is to investigate the stylistic approach of Selim Al Deen. The greatness of this Bangladeshi dramatist lies in his style that accurately captures the dramatic elements in the daily life of the regional and marginalized class people of Bangladesh. Selim's '**Prachcho'** is a play that accounts the fate-ridden life of a farmer from modern Bangladesh. While thematically adhering to the traditional framework of a mythical story, Selim applies his stylistic skills to make it relevant to the modern readers. He has used not only the regional dialect, Bongali,(বঙ্গালী) but also he concentrated on the class dialect, that is, the language of a farmer. My study here is also focused on the syntactical structure of the language used by Selim Al Deen in his drama '**Prachcho'**.*

পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের বা জ্ঞাপনের(Communication) অন্যতম মাধ্যম হল ভাষা। আমরা যে ভাষা'ই ব্যবহার করি না কেন, কথায় কিংবা লেখায় উভয় ক্ষেত্রের ভাষায় কিছু লক্ষণ ফুটে ওঠে। সেই লক্ষণগুলিকে আমরা ব্যাকরণগত লক্ষণ বলে জানি। মানুষের ভাব প্রকাশের ভাষায় থাকে এক ধরনের নিজস্ব স্বতন্ত্রতা। তাদের বিন্যাস ও ব্যবহারবিধির স্পষ্ট নিয়মনীতি থাকে। ব্যক্তিগত প্রবণতার কারণে অনেক সময় সেই প্রয়োগবিধি প্রচলিত বলয়ের গণ্ডী অতিক্রম করে যায়। এই অতিক্রমের নিয়মরীতিকে সব সময় অশুদ্ধ বলা যায় না। বিশেষত যখন লেখকের কাঙ্ক্ষিত বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি-সূত্রে তা ব্যবহৃত হয়। ভাষা ব্যবহারের এই ধরনের বৈচিত্র্য নূতন শৈলীর সৃষ্টি করে। শৈলী হল ব্যক্তির ভাষা প্রয়োগের নিজস্বতা। সে নিজস্বতা চিহ্নিত হতে পারে লেখকের ভাষা-প্রয়োগের সামগ্রিক বা বিশিষ্ট কিছু লক্ষণের ভিত্তিতে।

সাহিত্য সমালোচনায় 'শৈলীবিজ্ঞান'(Stylistics) এক অভিনব দিগ্‌দর্শন। ভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভব যেমন ভাষার বিজ্ঞানমুখী অনুশীলন থেকে হয়েছে, ঠিক তেমনি শৈলীবিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটেছে সাহিত্যের বহুমুখী ভাষা বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ থেকে। সাহিত্য মূলত ভাষা-শিল্প, ভাষার মতো সাহিত্যের রয়েছে নিজস্ব এক ব্যাকরণী পাঠ। ইংরেজি 'Stylistics' শব্দের অনুসরণে সৃষ্ট শৈলীবিজ্ঞান অভিধাটি বর্তমান বাংলা ভাষা-চর্চায় বহুল প্রচলিত ও সর্বজন স্বীকৃত। শৈলীর বিশ্লেষণ পুরোপুরি বস্তুবাদী, রচনার সঙ্গে বয়ানের অন্তর্গত তন্ময়(Objective) উপাদানের সমাহারকেই প্রাধান্য দেয়। যেমন, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, শব্দ, বাক্য অর্থ এবং সমগ্র বয়ান ইত্যাদি। প্রতীচ্যের মনীষীদের মতে শৈলী হল, বিশেষ নির্মাণ যা ব্যক্তি সাপেক্ষ, বা বলা যায় রচনাকারীর নিজস্ব ব্যাপার। প্রসঙ্গত Buffon বলেছিলেন, 'Style is the man himself'.। শৈলীর সংজ্ঞা

হিসেবে ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকার বলেছেন যে, যার সাহায্যে লেখক ও পাঠকের অভিপ্রেত যোগাযোগ সাধন করা সম্ভব।

ভাষা হল সাহিত্যের শিল্পরূপ নির্মাণের প্রধান উপকরণ। ভাষা প্রসঙ্গভেদে (Contextual Variation) পরিবর্তিত হয়। খেলার মাঠের ভাষা প্রয়োগের রীতি একরকম, আবার ধর্মীয় সভার ভাষা ব্যবহারের রীতি অন্য রকম। ভাষার শব্দমালার শারীরিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য লেখকের ভাবনা ও বেদনার অন্দরমহলে পৌঁছতে সাহায্য করে। লেখক যে ধরনের প্রতিক্রিয়া পাঠকের মনে উদ্রেক করতে চান, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তাঁর প্লট নির্মাণ করেন। লেখক পাঠককে হাসাতে চান? কিংবা কাঁদাতে? উত্তেজিত করতে? শিক্ষা দিতে? অথবা কোনো সামাজিক কু-প্রথাকে আক্রমণ করতে চান সব কিছুই তাঁর লেখার শৈলীকে বিশিষ্টতা দিয়ে থাকে। ভাষাশৈলী বিচার বিশ্লেষণের দক্ষতা থেকে লেখককে সহজে অনুধাবন করা যায়। এছাড়াও লেখকের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত করে দিতে পারে তাঁর স্থানিক পরিচয় বা সামাজিক শ্রেণি।

মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি ভাব অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে নাটক। নাটকের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতার সম্পর্ক সরাসরি ও প্রত্যক্ষ। প্রতিটি নাটকের চারটি প্রধান উপাদান থাকে। এগুলো হচ্ছে – ১. কাহিনি বা বিষয়, ২. চরিত্র, ৩. সংলাপ, এবং ৪. পরিবেশ। নাটকের কাহিনি, চরিত্র ও সংলাপকে অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নাট্যকার পরিবেশ তৈরী করেন। সংলাপ কখনো গদ্য এবং পদ্যরীতি অবলম্বন করে। নাচ, গান, শব্দ সংযোজন, আলোকবিন্যাস, কাহিনি অনুযায়ী দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জা এবং মঞ্চনির্মাণ কৌশলের মাধ্যমে নাটকের পরিবেশ নির্মাণ করা হয়। সেদিক থেকে সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮) বাংলাদেশের নাট্যধারায় নানা রীতির অভিনব সংযোজনে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে বাঙালি জাতির নাড়ির যে সুগভীর টান রয়েছে নাটকে তিনি তার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। সেলিম আল দীন বিশ্বাস করতেন, বাংলা জনপদের মানুষের জীবনাচরণে রয়েছে নাটকীয় উপাদান। প্রান্তিক মানুষের নিত্যকার যাপিত জীবন কথা তিনি তাঁর নাটকের বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন।

'প্রাচ্য' নাটকটি এক আশ্চর্য সুন্দর সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্যের বহু-পঠিত কাহিনি নাট্যকারের হাতে নবরূপ পেয়েছে। এই নাটক একদিকে যেমন চিরায়িত আবার অন্যদিকে সমকালীন। সাপের কামড়ে সদ্য বিবাহিত এক বধূর করুণ মৃত্যুর কাহিনি অবলম্বনে সেকালের ফ্রেমে এযুগের সমস্যাকে দেখিয়েছেন। নোলক ও সয়ফরের বিয়োগাত্মাক প্রণয়গাথা যেন একালের বাঙালির অন্তঃপুরের কাহিনি হয়ে উঠেছে। লোক-কাহিনির বেহুলার মতো 'প্রাচ্য'র কাহিনিতে বাসরঘরে বাসর রাতে নোলক বিধবা হয়নি বরং সদ্য বিবাহিত সয়ফর নব পরিণিতা স্ত্রী নোলককে হারিয়েছে। বেহুলা লখিন্দরের কাহিনির মতো 'প্রাচ'তেও খল চরিত্র হিসেবে নাট্যকার বিষাক্ত সাপকে উপস্থাপনা করেছেন। সেলিম আল দীন সাপের প্রতীকে পদ্মপুরাণের মনসাদেবীকে নয় অশুভ শক্তিকে উপস্থাপনা করেছেন। এক ভাগ্যহত চাষীর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের গল্প বিধৃত নাটক হল প্রাচ্য। তাই বলা যেতে পারে, পুরাতন লোককথার সমান্তরালে সূচনা হলেও 'প্রাচ্য' নাটকটি হয়ে উঠেছে সংবেদনশীল আধুনিক মানুষের জীবনভাষ্য।

শুধু আঞ্চলিক উপভাষা (Regional Dialect) নয়, শ্রেণি উপভাষার (Class Dialect) প্রয়োগেও এ নাটক ঋদ্ধ। পূর্ববঙ্গের প্রধান উপভাষা বঙ্গালী। মূলত পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ ঢাকা, মৈমনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, নোয়াখালি, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সোনাগাজী প্রভৃতি অঞ্চলে বঙ্গালী উপভাষা প্রচলিত। সেলিম আল দীন তাঁর নাটকে উপস্থিত চরিত্রের সংলাপগত উপস্থাপনার মাধ্যমে চরিত্রের আঞ্চলিক ও শ্রেণিগত পরিচয় পাঠকের কাছে স্বচ্ছ ভাবে তুলে ধরেছেন।

'প্রাচ্য' নাটকের চরিত্রদের সংলাপে নাট্যকার বঙ্গালী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ করেছেন। কেননা এটি বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান উপভাষা।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক। অপিনিহিতি জাত শব্দের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন –

চারি > চাইর

১। আমার বিয়ার সমে **চাইর** ভরি সোনা তিনখানা ভেড়া ঠ্যাঙ্গামারার চরের ডেগা মইষ একটা। পৃ – ২৭

দেখিয়া > দেইখ্যা

২। ও দাদি গো **দেইখ্যা** যাও। পৃ – ৪৪

কালি > কাইল, আজি > আইজ

৩। তুই **কাইল** থিকা **আইজ** সাঁইজ লাগে পুরা উপাস। পৃ – ৮১

রাতি > রাইত

৪। **রাইত** ভর আমিও খামু না। পৃ – ৯৩

খ। **'এ'** ধ্বনি, **'অ্যা'** ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন –

কেন > ক্যান

১। আমি যামু না মা। আমারে **ক্যান** পর কইরা দিলা। পৃ - ১৭

কেন > ক্যান, পেট > প্যাট

২। **ক্যান** আমার কি **প্যাটের** গোলমাল। পৃ – ২৩

তেল > ত্যাল

৩। সইরষার **ত্যাল** মাখ। পৃ – ৬৩

শেষ > শ্যাষ

৪। **শ্যাষ** চেষ্টা **শ্যাষ** হইল। পৃ – ৭১

গ। **'ও'** ধ্বনি অনেক সময় **'উ'** ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যথা –

তোমার > তুমার

১। বাড়ি গিয়া **তুমার** বাপ মাওরে খবর দাও। পৃ – ৬২

২। জীবন বান্ধা দিয়া বিয়া করছি না **তুমারে**। পৃ – ৬২

৩। এই কি অবিচার খোদাগো **তুমার**। পৃ – ৬৭

ঘ। বঙ্গালী উপভাষায় 'খ'-এর উচ্চারণ অনেকসময় 'হ' –এর মত হয়েছে। যেমন –

এখন > এহন

১। এতক্ষণ ত খোলসের একবার ন্যাজ একবার মাতা ধইরা ঘুড্ডি উড়ান উড়াইছেন **এহন** ক্যান ডরান। পৃ-৩৯

এখানে > এহানে

২। **এহানে** কি কর। পৃ – ৪৬

যখন > যহন, তখন > তহন

৩। **যহন** ঠ্যাঙ্গামারির চরে রইদের ঝিলিকে গাঙের ঢেউ সোনার চিলিক দিল **তহন** কি মনে হইল জানেন। পৃ – ৫৫

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক। গৌণকর্ম কারকে **'রে'** বিভক্তি বসে। যেমন –

১। **আপনেরে** ডাকাইতের মতন লুট করতে ইচ্ছা করে। পৃ – ৫২

২। **আপনেরে** বুকের উপর উঠায়ে গপ্প করি। পৃ – ৫৬

৩। **আমারে** নিয়া মেলকামি করতাছস। পৃ – ৯২

৪। **আমারে** জিততে হব। পৃ – ৯৮

খ। কর্তৃকারক ছাড়া অন্যকারকের বহুবচনে **'গো'** বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন –

১। **আমাগো** ঘরেও একখানা আছে না দাদি। পৃ – ৫১

২। **আমগো** আবার বাঁচন কিয়ের রে দিদি। পৃ – ৮৯

গ। করণ কারকে **'এ'** বিভক্তির সঙ্গে **'দিয়া', 'লগে'** প্রভৃতি অনুসর্গ ব্যবহার হয়। যথা

১। তর গায়ের **লগে** লাইগ্যা হারিকেন উল্টাইছে। পৃ – ৯২

ঘ। রাঢী উপভাষার অতীতকালে ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় নঞর্থক অব্যয় 'নি'। কিন্তু বঙ্গালীতে সাধারণত 'নাই' বসে। নাটকে ব্যবহৃত ক্রিয়ার সঙ্গে 'নাই' যুক্ত হয়েছে। দৃষ্টান্ত –

১। মেয়েদের শরীর দেখে **নাই**। পৃ – ২৬

২। নৃত্যকের নাচ তখনও থামে **নাই**। পৃ – ৪৯

'শৈলী' হল এমন এক গুণ যা সমস্ত প্রকাশের মধ্যে থাকে। 'Meaning and Style' গ্রন্থে Stephen Ullman বলেছিলেন – 'Style is to the writer what colour is to the painter'. তাঁর মতে শৈলী হল চিত্রশিল্পীর রঙের তুলির মত। এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, শৈলী (Style) হল মূলত ব্যক্তিগত বিষয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছিলেন –'রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিত ভাবে বুঝায় ; কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।' (সাহিত্য : সাহিত্যের সামগ্রী, পৃ-১৮)

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই 'ব্যক্তিগত শৈলী' বা 'ভাবপ্রকাশের উপায়' কি ? কেউ বলবেন আদর্শ নিয়মরীতি থেকে বিচ্যুতি আবার কেউ বলবেন চিরাচরিত বাক্যিক নির্মাণ ও শব্দপ্রয়োগ থেকে সরে আসা। কেননা প্রতিভাধর শিল্পী ও সাহিত্যিক কখনো যুগ প্রচলিত নিয়মের আনুগত্যে বিশ্বাসী নন। বিশেষ প্রয়োগে ও বিশেষ অর্থে শব্দ হয়ে উঠবে সাহিত্যের গর্ভগৃহের চাবিকাঠি। কারণ রচনার যাবতীয় প্রসঙ্গে (Context) প্রত্যেক লেখকের একটা নিজস্বতা রয়েছে। সেই নিজস্ব রচনালক্ষণ অন্যদের থেকে তাঁকে স্বতন্ত্র করে তোলে। প্রত্যেক শিল্পীর সমাজ-সাংস্কৃতিক পটভূমি, বেড়ে-ওঠা, শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি আলাদা আলাদা। এমনকি একই বিষয় নিয়ে লেখা দুই জন লেখকের রচনাভঙ্গি পৃথক। শৈলী হল অনেকটা আঙুলের টিপসই'র মত অনন্য। রচনা স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে লেখকের প্রয়োগরীতির অভিনবত্বে। রচনাকারের নাম না জানা থাকলেও রচনাটি অনুধাবন করে অনুমান করে ফেলতে অসুবিধে হয় না, কোন্‌টি বঙ্কিমের আর কোন্‌টি শরৎচন্দ্রের। যার মধ্যে থাকে লেখকের ধ্বনিগঠন, বাক্যগঠন, শব্দ প্রয়োগ, সংযোজক প্রয়োগ, সমার্থক শব্দ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব বাক্য, 'যখন, তখন', 'যে, সে'র মত নির্দেশক প্রভৃতি বিষয়।

রচনার ভাব ও ভাষাগত সংলগ্নতা তৈরি হয় সংযোজকের (Connectives) মাধ্যমে। পাকা লেখকের দক্ষতা অনেকটাই নির্ভর করে সংযোজকের প্রয়োগে নিজস্ব মুন্সিয়ানার ওপর। পাঠকের অনুধাবনেও

রয়েছে সংযোজকের অবদান। প্রতিটি বাক্য'ই মূর্ত অথবা প্রছন্নভাবে তার পূর্ববর্তী বাক্যপরম্পরার সঙ্গে সংযুক্ত। সংযুক্তির কাজকে সহজ করে দেয় সংযোজক অব্যয়। সংযোজক অব্যয়ের নির্দিষ্ট কোন তালিকা নেই। নাটকের প্রচলিত সংযোজকের দৃষ্টান্ত –

১। সয়ফর দাদির কাছে রাখা মৃত মায়ের অলঙ্কার **যথা** সোনার হার সোনার দুল **এবং** ফিরোজা রঙের নাকফুল জরির কাজ করা কমলা বর্ণের মিশ্র সুতির একটা দামী শাড়ি দিয়েছে। পৃ – ১৯

২। অনেক সুদ পেল খানিক জমি পানির দামে **আর** সয়ফরের গরুটি দিব্যি **আরও** দৈনিক সোয়া সের করে দুধ দিতে থাকলে তার চোখের সামনে। পৃ – ৩৯

৩। **হয়ত** ঘরের ভেতর থেকে ছোবল হানা মুখে বয়ে এনেছিল গোক্ষুর তারপর কোনো কারণে খেতে পারে নাই **আর** সে নির্বিষ সাপটি গোক্ষুরের দাঁত বসানোর ফলে বাঁচতে পারে নাই। পৃ -৯৪

ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দের প্রয়োগ যে-কোন রচনায় সাংকেতিক দ্যোতনা বহন করে। এজাতীয় শব্দ প্রায়শ'ই পাঠকের মনোভূমিতে এক সংবেদন সৃষ্টি করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ধ্বনিগত শৈলীর আলোচনায় আধুনিক কালে ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দ সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। নাটকে ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দ হল –

১। সয়ফরের চোখ **চকচক** করে। পৃ – ১৩

২। বাপরে বাপ দেড় বেটারি ছেমরা কথা কয় না **ঠকাস ঠকাস** ইটা মারে। পৃ – ১৪

৩। কামলা **খাটতে খাটতে** গা গতরের চামড়া উইঠ্যা গেছে সংসারের অভাব ঘুচে না। পৃ – ৪০

৪। একজন এসে ছেনি দিয়ে **সাঁৎ সাঁৎ** কেটে ফেলে গাছগুলি। পৃ – ৪৪

৫। সয়ফর অন্ধকারে **ছপ ছপ** শব্দ শুনে। পৃ – ৪৬

৬। সয়ফর **থর থর** করে কাঁপে। পৃ – ৮৩

সেলিম আল দীনের মাঝারি কিংবা ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহারের দিকে বেশি ঝোঁক ছিল। তিনি 'প্রাচ্য' নাটকে অনেক ছোট ও মাঝারি আকারের সরল বাক্য গঠন করে নাটকটিকে অভিনব মাত্রা দিয়েছেন। যেমন-

১। নোলক কিশোরী। চওড়া কপালি। দীঘল চুল শাঁওলি ফুল। হলুদ মাখা শ্যামল ত্বক শোভন রূপ। থুতনি কাটা। দু চোখ দীঘল। পাতলা ঠোঁট। নাকে নাকফুল। পক্ষ্মনীলিম। হালকা পাতলা কিন্তু কোমল।। পৃ – ১৯

২। সত্তুর বছর পার হওয়া বুড়ি। অশক্ত। ঘরের দাওয়ায় শুয়ে আছে। দাদির সঙ্গে দুদিন ধরে কথা বন্ধ সয়ফরের। ভয়ঙ্কর ঝগড়া হয়েছে বলে। কি নিয়ে। ভিটা বাড়ি নিয়ে। পৃ – ৪০

৩। প্রণমহ বিষহরি। বিশ্বরূপা বিশ্বেশ্বরী। তুমি দেবী জগত জননী। তুমি দেবী হরসুতা। আস্তিকস্য মুনির মাতা। নাগমাতা ভুবন মোহিনী। তুমি শিবের নন্দিনী। ত্রিভুবনে উদ্ধারিণী। যোগ নিদ্রা যোগ সনাতনী। অষ্টনাগ সঙ্গে লয়ে। পূজা স্থানে নাম গিয়ে। সেবকের নিস্তারকারিণী। চতুর্মুখে প্রজাপতি। তোমাকে করেন স্তুতি। স্তব করে যত দেবগণ। ভব ভয় নিস্তারিণী। তুমি ত্রিতাপহারিণী। আসরেতে কর অধিষ্ঠান। মহামুনি জরৎকারু। সাধক জনের গুরু। সে তোমাকে বিবাহ করিল। হল তার ইচ্ছারঙ্গ মুনি। হল স্তব ভঙ্গ। তোমাত্যাজি কতদূর গেল। মুনির চরণে ধরি। রাখিলে বিনয় করি। পুনরপি ফিরিয়া আসিল। মুনি তোমা দিলে বর। জন্মিলেক পুত্রবর। আস্তিক কুমার নাম হল। অবোধ যে সদাগরে। তব সঙ্গে বাদ করে। অবশেষে লইল শরণ। অপুত্রীকে পুত্র দাও। নির্ধনীকে ধন দাও। রোগ শোক কর বিমোচন। মনসার শ্রীচরণ। যে জন করে স্মরণ। তার শত্রু নামে হয় ক্ষয়। মালেক ওঝা শুদ্ধমতি। পদ্মার চরণে গতি। চিরকাল রাঙাপদ চায়। পৃ – ৬৫

৪। আমি কি কমু হুজুর। বিষয়টা সয়ফরের। সে তার স্বামী। স্বামী যা বলবে তাই হবে। শরিয়তে আছে। পৃ - ৬৯

একাধিক বাক্যখণ্ডের মধ্যে সাপেক্ষ সম্বন্ধ তৈরী করে প্রতিনির্দেশক (Correlative)। প্রতিনির্দেশক বাংলা ভাষায় বিশেষ্যগুচ্ছ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নাট্যকার নাটকের একাধিক সংলাপে প্রতিনির্দেশকের প্রয়োগ করেছেন। যেমন -

১। সারাজীবনে **যে** নারীর শরীর তার নিত্য রাত্রির ছায়াসঙ্গী **সে** এখন কায়াময়ী। পৃ - ৫৪

এখানে, পূর্বনির্দেশক - যে

পরনির্দেশক - সে

পূর্বনির্দেশক + পরনির্দেশক = প্রতিনির্দেশক।

২। সয়ফর গাতা খুজে পায় এবং **যখন** দেখে সেটি সোজা ঘরের কোণে দিয়ে বাইরে চলে গেছে সে **তখন** গাতার মুখে শিল নোরার পুতা ঢুকিয়ে দিয়ে ছুটে বাইরে যায়। পৃ - ৯৭

এখানে, পূর্বনির্দেশক - যখন

পরনির্দেশক - তখন

পূর্বনির্দেশক + পরনির্দেশক = প্রতিনির্দেশক।

'স্ল্যাং' - এর ব্যবহার। নাটকে আঞ্চলিক স্ল্যাং শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে -

১। **শালা** বউটা নিয়া কি চাঙে তুইলা রাখবি। পৃ - ১৭

২। এ্যাই এ্যাদ্দুর জানলে কোন **হালারপুু** এই নোম্বার বিয়া খাইতে আসত। পৃ - ৪৩

৩। কোথায় পালাবি **হারামির** বাচ্চা। পৃ - ৮১

৪। আর কত খেলাবি **শুইয়ারের** বাচ্চা। পৃ - ৯২

নঞর্থক বা নেতিবাচক (Negative) নির্দেশক সব সময় বাক্যের শেষে বসে। বাক্যে ব্যবহৃত কোন ঘটনা বা তথ্য বা সংবাদ বা কোন বিষয় অস্বীকার করা হয় বা সে সম্বন্ধে আপত্তি প্রকাশ করতে 'না' এর প্রয়োগ হয়। নাটকে বেশিরভাগ বাক্যের শুরুতে এবং শেষে নেতিবাচক নির্দেশকের প্রয়োগে অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন -

১। **না** কোথাও রক্ত চিহ্ন **নাই**। পৃ - ৫৩

২। **না** কোনো শব্দ **নেই**। পৃ - ৯৬

আলোচনার শেষে বলা যায় যে, কোন সমাজকে যেমন তার বিবর্তনধারা থেকে আলাদা করে বিচার করা সম্ভব নয়, তেমনি কোন সাহিত্যিককে তাঁর নিজস্ব পরিবেশ থেকে আলাদা করে বিচার করা চলে না। নাটকের সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা-ব্যবহার ঘটে বিশেষ চরিত্র বা সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষাকে প্রতিফলিত করার উদ্দেশ্যেই। লেখকের শৈলী'ই লেখকের স্বাতন্ত্রতা গড়ে তোলে। প্রাচ্য নাটকের ভাষা ও শৈলীর প্রয়োগে সেলিম আল দীন অন্যদের থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছেন বা স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেছেন।

গ্রন্থঋণ :

১। আল দীন, সেলিম, 'প্রাচ্য' সেলিম আল দীন নাটকসমগ্র ৩, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪।

২। মজুমদার, ড. অভিজিৎ, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭।

৩। মাইতি, ড. প্রকাশ কুমার, 'আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা', আরামবাগ বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪।

৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য', সাহিত্যের সামগ্রী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।